অধরা!

॥ এস.এম. ফয়সাল ॥

আমি পুরুষ, তাই প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি পুরুষ জাতির পক্ষ থেকে। কারণ, পুরুষ শাসিত সমাজের কারণেই হোক কিবা নিয়তির কারণেই হোক মাঝে মধ্যে নারীকে জীবন দিয়েও অনেক বিষয়ের শোধ দিতে হয়। তেমনি একটি সত্য বিষয় নিয়ে লিখব বলে আমার আজ বসা। আর এটা আমি আমার জীবনের অনেকটা কাছে থেকে দেখেছি বলেই হয়তোবা আমার এই আদা-জলের এ প্রত্যয়। নচেৎ এমন অদ্ভুত(!) সূচনা বাণী আমার মাথায় আসত না হয়তো। আমি জানি এর মধ্যে আমি তিরিস্কৃত হতে পারি। বিচিত্র নয়। কিন্তু তার পরেও একটা সত্য প্রকাশিত হোক। এই যা।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বর্তমান সময়টা বিজ্ঞানের স্বর্ণ যুগ। চারদিকে এর জয়-জয়কার। এর পাশাপাশি মত প্রকাশ ও অধিকার আদায়ের স্বাধীন আমামা গুলো পত-পত করে উড়ছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার সংরক্ষণের বিভিন্ন নিত্য-নতুন তত্ত্ব এ বিশ্বায়নের যুগে আলোচনার টেবিল বা মঞ্চেই হোক, একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রিন্ট মিডিয়া কিংবা ইলেকট্রিনিক্স মিডিয়ার কথা বাধ দিলেও রাজনৈতিক বক্তব্যে এবং বিদেশী ফ্রি প্রেসক্রিপশনের কারণে এটা এখন নাম্বার ওয়ান ইস্যু। অত্যন্ত হাস্যকর বিষয় হলো যারা নিজের স্ত্রী কিংবা কাজের মেয়েকে অমানুষিক নির্যাতন করে এ নিয়ে তৃতীয় মাত্রাকে মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ত রাখেন তারাই আবার প্রগতিশীল হিসেবে সমাদৃত হন বেশি। যারা ঐ মাত্রায় যোগ না দিতে পারেন কিংবা ঐ রকম হতে না পারেন তারা আবার দুর্গতিশীল নামে পরিচিত। হায় আফসোস।

তবে প্রায়ই এমন সব ঘটনা ঘটে যা সকল তৎপরতা ও আয়োজনকে উপহাস করে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তোমরা যেভাবে আছ সেভাবেই থাক। আমাদের আর ওসবের প্রয়োজন নেই। আর হবেই বা না কেন? যেখানে দেশের রাজধানীতে পথে চলা পিতার হাত ধরা নিরপরাধ সন্তানের লাশ ঢলে পড়ে পিচ ঢালা রাজপথে দিন দুপুরে। এবং যে দেশের দায়িত্বশীল কর্তা ব্যক্তিরা -আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন সেখানে কোটি মানুষের এই দেশে রাজধানী থেকে অনেক দূরে কোন মফস্বল এলাকার কোন নারীর আর্তনাদ কতটুকুই বা আবেদন তোলার দাবী রাখে? আর স্বেচ্ছাসেবী ও বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থাগুলোর এয়ার টাইট দরজা-জানালা ভেদ করে ভারী পর্দা ঢেলে কিভাবেই পৌঁছতে পারে?

আমি এ কাহিনীর নায়িকা বা নায়কের প্রকৃত নাম প্রকাশ করতে চাই না। যদিও এ ঘটনা অনুসন্ধান বা তদন্তের কোন ভয় কিংবা আশা, কোনটাই নেই। এতে পাঠক আমাকে যা ভাবার ভেবে নিতে পারেন। আপত্তি নেই। তবে নাম তো দরকার। তাই নায়িকার নাম দিলাম অধরা। কেন এ নাম তা না হয় আপাতত নাই বললাম। তাহলে নায়কের তো নাম দরকার। তার নাম হোক জীবন। পাঠক আমি কিন্তু শুরুতেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।

আমি ক্লাস এইটে পড়ি। গ্রাম এলাকা সম্পর্কিত চাচা হয় জীবন। জীবনরা চার ভাই। সবাই প্রবাসী এবং জীবন সবার ছোট। আর্থিক অবস্থাও চলন সই। তাদের সাথে বিশেষ ভাবে পরিচিত কারণও আছে। তাদের দেশে যারা থাকে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদের বাড়ীতে আসতে হত। যেমন চিঠি লেখা; পড়ানো; ডাক্তার দেখানো; বিভিন্ন পরামর্শ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

জীবনদের বড় ভাই বিয়ে করেছিলেন আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় মাইল সাতেক দূরে আরেকটি গ্রামে। মেজ ভাই তো তাই। তাদের বিয়ে হয়েছিল পারিবারিক সম্মতির ভিত্তিতে। সব ছোট জীবন প্রবাস থেকে এসে গো-ধরল সে তার বড় ভাইয়ের শালীকে অর্থাৎ অধরাকে বিয়ে করবে।

পাড়া-প্রতিবেশী সবার মাঝে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল। এ কী রকম কথা! এক ঘরে সংসার করবে দুই বোন! যদিও এটা শাস্ত্রে কোন বাধা নেই। কেউ কেউ আবার নিজের সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে তাকে এর পরিণতি যে ভাল হবে না তাও অনেক বুঝালেন। কাজের কাজ কিছুই হলো না। অবশ্য, অধরার রুপের কোন বর্ণনা না দিলেও তাকে দেখা মাত্র যে কেউই তাকে অবহেলা করবে না, তা কিন্তু হলফ করে বলা যায়। আর এ জন্যেই হয়তো জীবনের এ সিদ্ধান্ত। অবশেষে জয়তু জীবন।

এখনো মনে পড়ে ঐ বিয়ের বরযাত্রী হওয়ার সুযোগ না হলেও ওয়ালিমা অনুষ্ঠানে ছিলাম। যাক, অধরা আসল এবং সেদিন থেকে এক ধরনের চাপা কলহ কিন্তু জানান ঠিকই দিয়েছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। জীবনের বড় দুই ভাই তখনও প্রবাসে। পরিবারের মুরব্বি তখন অধরার বড় বোন। অথচ, তিনিই কাল হয়ে দাঁড়ালেন! বিয়ের আগে যদিও তার জোরালো ভূমিকা ছিল জীবনের এ রকম মত গঠনের ক্ষেত্রে। কিন্তু, বিয়ের পর পরই গণেষ উল্টে যায়। তিনি কিছুতে ছোট বোনকে জা-এর মর্যাদা দিতে রাজী না। আর এটা যে মহাভারতে-অশুদ্ধের মত অন্যায় হয়েছে তাও তিনি অনেক কষ্টে জীবনকে বুঝাতে সক্ষম হলেন। তার মতের দল তখন ভারী। ধীরে ধীরে জীবনেরও আকর্ষণ কমতে থাকে অধরার প্রতি। বিয়ের রাঙা মেহেদী শুকানোর আগেই শুরু হয়ে যায় কলহ। একদিকে অধরা অপর দিকে জীবন ও তার ভাবী অধরার আপন বড় বোন। প্রায়ই শোনা যেত তাদের বাড়ী থেকে ঝগড়ার শব্দ যেন এ মহা অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে দেবর-ভাবী মিলে!

বিয়ের ছ-মাসের মাথায় জীবন ঘটাল এক অদ্ভূত কান্ড। সে একটি টেপ রেকর্ডারের অধরার অজান্তে তাকে মৌখিক তালাকের বিষয়টি আরেকজনকে সাক্ষী রেখে রেকর্ড করল। অবশ্য এর আগেই অধরাকে বেড়ানোর জন্য তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল। পরে ক্যাসেটটি পাঠিয়ে দিল অধরাকে শোনার জন্যে। স্বাভাবিক ভাবেই অধরা ও তার পরিবারের সবাই ক্যাসেটটি শুনল। শুনে তো হতভম্ব সবাই। কথায় বলে সুসংবাদের নাকি পাও নেই, আবার দুঃসংবাদে নাকি পাখাও আছে। পাখা নিজে না দেখলেও এর প্রয়োগিক দিক বিবেচনায় অবশ্য তা মানি।

অনেক দেন দরবার, তদবির, নসিহত, আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব। কিন্তু, কিছুতেই জীবনকে রাজী করানো যায় না। দেখতে দেখতে সপ্তাহ, মাস, বছর তাও এক দুই। কিন্তু না, কোন পরিবর্তন নেই। অন্যদিকে অধরার বড় বোনও সে যাতে পুনরায় আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে অথবা এক্ষেত্রে জীবন যে নির্দোষ এবং সকল দোষ যে অধরার তার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সম্ভব সব ধরনের দায়িত্ব অত্যন্ত যত্নের সাথে পালন করেছিল।

দীর্ঘদিন পর হঠাৎ খবর পাওয়া গেল অধরা খুবই অসুস্থ। তার শেষ বারের মত ইচ্ছে তার স্বামীকে দেখার। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। পাড়া-প্রতিবেশির অনেক অনুরোধ সত্বেও জীবনকে তার সে নমনীয় না হওয়ারও কঠোর শপথ থেকে নড়ানো সম্ভব হল না। সে যে পুরুষ! পরে সমাজ রক্ষার্থে কয়েকজন প্রতিবেশী বাধ্য হয়ে গেলেন তাকে দেখতে। পরের অবস্থা আরো মর্মস্পর্শী। তারা এসে অধরার অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিল তা আমার এ ক্ষুদ্র জ্ঞানে প্রকাশ করা অসম্ভব প্রায়। তবে পুরুষের হিম্মত নিয়ে লিখতে বসেছি বলে কথা!

স্বামীর বাড়ী থেকে যখন অধরা বাপের বাড়ী গিয়েছিল তখন অল্প কিছু জিনিস পত্র নিয়েছিল সাথে করে। কয়েকদিনের জন্যে। কিন্তু এ যাওয়া যে তার শেষ যাওয়া এটা না বুঝাটাই ছিল তার অপরাধ(!) তালাক প্রাপ্তির অপরাধে অধরার উপর নেমে আসে এক অমানুষিক নির্যাতন। মা, ভাই-বোন, ভাবী মিলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতে থাকে তার উপর। এমন নির্যাতন কোন পরিবারের একজন সদস্যের উপর কোন পরিবার চালাতে পারে তা ভাবতেই শরীরের রক্ত হীম হয়ে আসে। অবস্থা দাড়ায় এমন যে কোন ভাবেই তার অস্তিত্ব নীল করতে পারলেই যেন সবাই বাঁচে ও বংশ মর্যাদা রক্ষা পায়! তাদের বংশ মর্যাদা ও আত্মসম্মান জ্ঞান যে অনেক! এদিকে তার বড় বোনের সাফ কথা, কোন ক্রমেই সে যেন পুনরায় তার স্বামীর কাছে আসতে না পারে। তা হলে যে তার অমার্যাদা হয়! অথচ যার সৌন্দর্য্যের কারণেই হোক কিংবা যোগ্যতার কারণেই হোক সে ছিল তার পরিবারের মধ্যমনি। সময়ের ব্যবধানে সে কিনা সবার কাছে অপয়েয়া ঠেকছে। সব মিলে অবস্থা দাড়িয়েছিল এই যে কোন ক্রমে সে এ নশ্বর স্থান ত্যাগ করলেই সেও বাঁচে অন্যরাও দায়িত্ব মুক্ত হয়। হয়ত অধরাও তা বুঝে নিয়েছিল, সে এখানে অপাংতেয়।

সবাই মিলে এর জন্যে আয়োজন ও পরিকল্পনার কোন ঘাটতি করেনি। তাকে বাইরে বেরুতে দেওয়া হত না; ভালো কাপড় পড়তে দেওয়া হত না; কথা মতো না চললে ছোট বড় সবাই মারপিট করত; ঘরে তালা দিয়ে রাখত-যাতে বাইরে পালিয়ে যেতে না পারে। মাঝে মাঝে তাকে পাগল বলে বেঁধে রাখা হত! ঠিকমত খাবার দেওয়া হত না! সবার খাওয়ার শেষে যা থাকত তাই ছিল তার ভাগে; না থাকলে উপোষ থাকতে হত; পুরাতন ও ছেড়া কাপড় পরতে তাকে যাতে, সে লজ্জায় বাইরে বেরুতে না পারে। তাহলে যে তা মানহানি হবে! রোগ-বালাইয়ে তো ঔষধ বা চিকিৎসার কোন প্রশ্নই আসে না।

চরম শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের ফলে এক পর্যায়ে দ্রুত তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। পরিবারের সবার অপেক্ষা। কবে আপদ বিদায় হয়। অবশেষে প্রতিক্ষার প্রহর ঘনিয়ে আসল। অধরা শয্যাশায়ী। তার উঠে বসার ক্ষমতা নেই। সে বার বার মিনতি করছিল যে শেষ বারের মতো যেন তার স্বামীকে তাকে দেখানো হয়। তখনই তারা খবর পাঠিয়েছিল জীবনের পরিবারের কাছে। মানবিক দায়িত্ব বলে কথা! অবশ্য ভিতরে ভিতরে জীবনদের পরিবার তা জানত। এবং নতুন কনের খোঁজও করছিল!

যখন অধরার শ্বশুর বাড়ীর লোকজন তাকে দেখতে গেলেন, প্রথমে কেউই তাকে চিনতে পারেনি। একজন হাস্যোজ্জ্বল, চঞ্চল, ষোড়শীকে তখন তারা দেখেনি। তারা দেখছিল জীবন যুদ্ধে পরাজিত মৃতপ্রায় এক কঙ্কালসার নারীকে। তাকে চেনার কোন উপায় ছিল না। অবশ্য কেউই চোখের পানি সংবরণ করতে পারেনি। শুধুমাত্র অধরার উজ্জ্বল চোখ দুটিই কেবল জানান দিচ্ছিল-আমি তিন বছর আগের তোমাদের সে জা-ভাবী, অধরা।

অধরা কিন্তু সে দিন চোখের কোন পানি ফেলেনি। শুধুমাত্র উদাস চোখ দুটি দিয়ে সবার দিকে অবাক ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সে আশ্চর্য হয়েছিল যে তার জন্যে এ পৃথিবীতে কেউ কাঁদতে পারে? এ রকম কেউ আছে এখনো? তার কান্নার ভান্ডার ফুরিয়ে গিয়েছিল, হয়তো। সে অনেক কষ্টে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করেছিল-আমি কি অপরাধ করেছিলাম যে আমাকে আমার স্বামী-সামনাসামনি কিছু না বলে ক্যাসেটের মাধ্যমে তালাক দিল? কেন সে আসল না আমার শয্যাশায়ী অবস্থা জেনেও? অল্প এই কয়েকটি কথা ছাড়া সে দিন আর কোন শব্দ তার মুখ দিয়ে বের হয়নি এবং কথাগুলি বলেই সে হাঁফিয়ে উঠেছিল। আর কোন কথাই বলতে পারেনি। সবাই ফিরে আসার সময় সে শুধু বার কয়েক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল। তার অবস্থা যেন জানান দিচ্ছিল, অচিরেই চির অধরা হয়ে যাওয়ার। যেখানে কেউ তাকে হাজার চেষ্টা করেও ধরতে পারবে না। কাউকে মিনতি করে নিরাশ হতে হবে না। যেখানে নেই পারিবারিক নির্যাতনের নামে কোন টর্চারসেল।

সপ্তাহ না শেষ হতেই জানা গেল অধরা পাড়ি দিয়েছে তার শেষ মঞ্জিলে। যেখানে শুধু যাওয়াই যায়। কেউ ফিরে আসে না ভুলেও।

সময়ের ব্যবধানে হোক আর বাস্তবতার তাগিতেই হোক ঐ দিকটা মাড়ানো হয়নি বেশী। শুনেছি, এখন জীবন তার নতুন জীবন সঙ্গী নিয়ে ভালোই আছে! সময়ের ব্যবধানে বাচ্চা-কাচ্চায়ও তার সংসার ষোলকলায় পূর্ণ।

সব কিছুই আগের মতোই চলছে। প্রতিদিন সূর্য তার অতি পুরাতন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পুর্ব আকাশে উদিত হয়, যথারীতি জীবন শক্তি বিলিয়ে দিয়ে পশ্চিমে ঢলে পড়ে পরের দিনের প্রস্তুতি নিতে। কিন্তু, কিছু অধরারা আর ফিরে আসে না। এভাবেই হারিয়ে যায় স্মৃতির অতলে। শুধু থেকে যায় তাদের অতৃপ্ত দুঃখ-ব্যাথা আর না বলা কথাগুলো। যা শুধুই শেষ রাতের আকাশে ব্যথা ভরা তারার মতই মিটিমিটি জ্বলতে থাকে অনন্ত কাল।

এভাবে কত অধরার জন্ম আমাদের সমাজে হয়েছে, আর হারিয়েও গেছে তার ইয়াত্ত ক'জনইবা রাখে। কিন্তু তাদেরও তো জীবন ছিল, স্বপ্ন ছিল, ছিল এ সুজলা ভূ-পৃষ্ঠে বেঁচে থাকার আশা, আর স্বাভাবিক মৃত্যুর অধিকার। হয়তো নারী হিসেবে জন্মের অপরাধেই(!) তাদের এসব বলতে নেই। চিন্তা করতে নেই, নেই ফরিয়াদ করতে।

স্রষ্টা তো নারীকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন একই ভাবে সৃষ্টি করেছেন পুরুষকে। একে অপরের সহযোগীতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমেই তো চলতে হবে। তাহলে কেন এত বাঁধা? কেন এত সংযম? আজ ইচ্ছে করে সত্ত্বার সকল শক্তিকে একত্রিত করে বলতে- যারা নারীর অধিকার; ক্ষমতায়ন তত্ত্ব নিয়ে মুখে ফেনা তুলছেন তারা কী পেরেছেন নারীদেরকে দিতে? আজ একাডেমিক জ্ঞান; কর্ম ও তত্ত্বের কোন অভাব হয় না নারীর অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে। আমার প্রশ্ন, কি উপকারে আসে এতে? শুধুমাত্র পুরুষকে প্রতিপক্ষ করা ছাড়া আর কি উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পেরেছেন? তবে চরম ও পরম সত্য কথা হলো-যদি নারী ও পুরুষের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, দায়িত্ববোধ ও পরস্পরের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ও স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের মতো পরিবেশ এবং তা মেনে চলার মানসিকতা তৈরী করা যায় তাহলেই কেবল প্রকৃত শান্তি আসতে পারে সমাজে। তখনই অধরাদের আত্মা শান্তি পাবে।

আজ সমাজপতিদের কাছে আমার ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসা; এরকম আর কত অধরা এ ধরা থেকে এভাবে নির্বিচারে বিদায় নেবে? অথচ তারা নিজেও জানে না কি জন্যে তারা এই গ্লানি টানছে। আছে কি এ সমাজের কাছে কোন জবাব? কি জবাব আছে দেবার মত তাদের উদ্দেশ্য? তবে আশার কথা হলো যারা ধর্মে বিশ্বাসী তারা কিন্তু পরকাল বলতে একটি বিষয়ে আশাবাদী এবং সেখানে সার্বজনীন বিচারের ক্ষেত্রে পুরস্কৃত হওয়ার প্রত্যাশী সবাই। তাহলে ঐ দিনের বিচারকের কাছে এ প্রশ্নের উত্তরটা তোলা থাক।

(একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে শুধু মাত্র গোপনীয়তার স্বার্থে কিছু পরিবর্তন করা হযেছে)

লেখকঃ **সদস্য-*অ্যামেনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, সমাজ কর্ম বিভাগ, শাবিপ্রবি, সিলেট।***
E-smfaysalsust@gamil.com মোবাঃ ০১৭২৫-৭৬১০১১